সৃষ্টি-তত্ত্ব।

ব্রহ্ম হইতেই সৃষ্টি। সৃষ্টিলীলা অনাদি। ব্রহ্ম বা ঈশ্বরই জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা। "জন্মাদ্যস্য যতঃ" ইত্যাদি বেদান্তসূত্র, "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে"—ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য এবং "জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াৎ" ইত্যাদি শ্রীমদ্-ভাগবতোক্তি (১।১।১) তাহার প্রমাণ। সৃষ্টিলীলার আদি নাই ; অনাদিকাল হইতেই সৃষ্টিপ্রবাহ চলিয়া আসিতেছে —ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হয়, আবার মহাপ্রলয়ে তাহার ধ্বংস হয়; আবার সৃষ্টি হয়—এইরূপ।

লীলাবশতঃ সৃষ্টি। "লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্—বেদান্তসূত্র ।২।১।৩৩॥" কেবল লীলাবশেই সৃষ্টিকার্য্যে ভগবানের প্রবৃত্তি হইয়াছে, কোনওরূপ ফলাভিসন্ধান বা প্রয়োজনের বশে নহে। তিনি আপ্তকাম, তিনি পরিপূর্ণ-স্বরূপ ; তাঁহার কোনও অভাব বা প্রয়োজন থাকিতে পারেনা। সুখোন্মত্ত ব্যক্তি যেমন সুখের উদ্রেক বশতঃই নৃত্যাদি করিয়া থাকে, তদ্রূপ স্বরূপানন্দ-স্বভাব-বশতঃই ভগবান্ অন্যান্য লীলার ন্যায় সৃষ্টিলীলাও করিয়া থাকেন। "সৃষ্ট্যাদিকং হরির্নৈব প্রয়োজনমপেক্ষ্য তু কুরুতে, কেবলানন্দাদ্ যথা মত্তস্য নর্ত্তনম্। গোবিন্দভাষ্য ।২।১।৩৩॥"

লীলায় করুণা। যাহা হউক, ভগবান্ লীলারস-রসিক বলিয়া লীলাই তাঁহার স্বভাব ; আবার তিনি পরম-করুণ বলিয়া জীবাদির প্রতি করুণা-প্রকাশও তাঁহার স্বভাব ; এই কারুণ্যবশতঃই "লোক নিস্তারিব এই ঈশ্বর-স্বভাব" হইয়া পড়িয়াছে। বাস্তবিক আনন্দ-রসাবেশে তিনি যে সমস্ত লীলা করিয়া থাকেন, সেই সমস্ত লীলা হইতেই আনুষঙ্গিক ভাবে তাঁহার করুণাও প্রকাশিত হইয়া থাকে—করুণা-প্রকাশ-বিষয়ে তাঁহার অনুসন্ধান না থাকিলেও ইহা হইয়া থাকে ; কারণ, করুণা তাঁহার স্বরূপ-শক্তির বিলাস-বিশেষ ; লীলাও স্বরূপ-শক্তিরই বৃত্তি ; তাই—যেখানেই প্রজ্বলিত অগ্নি, সেখানেই যেমন আলোক থাকিবে, তদ্রূপ—যেখানে স্বরূপ-শক্তির বিকাশ, সেখানেই করুণা থাকিবে ; তাই ভগবানের যে কোনও লীলাতেই আনুষঙ্গিক ভাবে করুণার অভিব্যক্তি দেখিতে পাওয়া যায়।

কিন্তু সৃষ্টিলীলাতে কাহার প্রতি কিরূপে করুণা প্রদর্শিত হইল? করুণা প্রদর্শিত হইয়াছে—বহির্ম্মুখ জীবের প্রতি।

পঞ্চনিত্যবস্তু। সৃষ্টিলীলায় জীবের প্রতি করুণা। কাল, কর্ম্ম, মায়া, জীব ও ঈশ্বর—এই পাঁচটী বস্তু নিত্য—অনাদি। ইহা স্বীকার না করিলে সকল বিষয়েই অনবস্থা-দোষ জন্মিবে। ব্যাসদেব ধ্যান-নেত্রে এই পাঁচটী অনাদি-তত্ত্বের দর্শনও পাইয়াছিলেন। এই পাঁচটী নিত্যবস্তুর মধ্যে কাল, কর্ম্ম ও মায়া এই তিনটী জড়—অচেতন ; আর ঈশ্বর চিদ্‌বস্তু, বিভু-চিৎ ; জীব অণুচিত, চিৎকণ। যাহা হউক, এই অনাদি কর্ম্ম বা অদৃষ্ট বশতঃ কতকগুলি জীব শ্রীকৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ হইয়া ভগবৎ-সেবা-সুখের নিমিত্ত লালায়িত না হইয়া মায়িক জগতের সুখভোগের নিমিত্ত অনাদি কাল হইতে লালসান্বিত হইল। তাহাদের এই অদৃষ্টের নিবৃত্তি না হইলে শ্রীকৃষ্ণোন্মুখতা অসম্ভব, সুতরাং তাহাদের পক্ষে শ্রীকৃষ্ণসেবা-সুখ-লাভও অসম্ভব। কিন্তু সাধারণতঃ ভোগব্যতীত অদৃষ্টের নিবৃত্তিও সম্ভব নহে, আবার ভোগায়তন-দেহ ব্যতীত অদৃষ্টের ভোগও সম্ভব নহে। অদৃষ্টজনিত মায়িক-সুখ-দুঃখ-ভোগের নিমিত্ত মায়িক বা প্রাকৃত ভোগায়তন দেহের প্রয়োজন ; প্রাকৃত-ব্রহ্মাণ্ডাদির সৃষ্টি ব্যতীত মায়িক-ভোগায়তন-দেহ-প্রাপ্তিও ঐ সমস্ত জীবের পক্ষে অসম্ভব। ভগবান্ লীলাবশতঃ যখন মায়িক ব্রহ্মাণ্ডাদির সৃষ্টি করেন, তখনই ঐ সমস্ত জীব মায়িক-ব্রহ্মাণ্ডে স্ব-স্ব-অদৃষ্টানুরূপ ভোগায়তন দেহকে আশ্রয় করিয়া কর্ম্মফল ভোগ করিবার সুযোগ পায় এবং মায়িক-ব্রহ্মাণ্ডের দুঃখ-যন্ত্রণাদিতে উত্যক্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ-বহির্ম্মুখতার বিষময়ত্ব অনুভব পূর্ব্বক কৃষ্ণোন্মুখতা-লাভের এবং শ্রীকৃষ্ণ-সেবা-লাভের উপযোগী সাধন-ভজনেরও সুযোগ পাইয়া জীব ধন্য হইতে পারে। সৃষ্ট-ব্রহ্মাণ্ডে এই সমস্ত সুযোগই জীবের প্রতি ভগবানের করুণার পরিচায়ক। এইরূপে দেখিতে পাওয়া যায়—ভগবানের দিক্ দিয়া বিচার করিতে গেলে সৃষ্টিকার্য্যে ভগবানের কোন বিশেষ উদ্দেশ্য না থাকিলেও, বহির্ম্মুখ জীবের দিক্ দিয়া বিচার করিলে একটা

বিশেষ উদ্দেশ্য দেখিতে পাওয়া যায়—সেই উদ্দেশ্যটী হইতেছে জীবের অদৃষ্ট-ভোগ। ইহা অবশ্য সৃষ্টিকর্ত্তা ভগবানের সঙ্কল্পিত উদ্দেশ্য নহে—তাঁহার স্বরূপানুবন্ধি কারুণ্যের বিকাশে আপনা-আপনিই এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়া গিয়াছে; আমরা—বহির্ম্মুখ জীব আমরা—তাই মনে করি, আমাদের অদৃষ্ট-ভোগের নিমিত্তই পরম-করুণ ভগবান্ বৈচিত্রীময় জগতের সৃষ্টি করিয়াছেন। "এভির্ভূতানি ভূতাত্মা মহাভূতৈর্মহাভুজ। সসর্জ্জোচ্চবচান্যাদ্যঃ স্বমাত্রাত্মপ্রসিদ্ধয়ে॥ শ্রীভা, ১১।৩.৩॥—নবযোগেন্দ্রের একতম অন্তরীক্ষ নিমি-মহারাজকে বলিলেন—হে মহাভুজ, সর্ব্বভূতাত্মা আদ্যপুরুষ এসমস্ত মহাভূতদ্বারা, স্বীয় অংশভূত জীবের বিষয়ভোগের জন্য এবং মুক্তির জন্য, দেবতির্য্যগাদি ভূতসকলের সৃষ্টি করিয়াছেন। বুদ্ধীন্দ্রিয়মনঃপ্রাণান্ জনানামসৃজৎ প্রভুঃ। মাত্রার্থঞ্চ ভবার্থঞ্চ আত্মনে কল্পনায় চ॥ ১০.৮৭।২।—প্রভু পরমেশ্বর জীবদিগের বিষয়-ভোগের নিমিত্ত, ভববন্ধহেতু কর্ম্মাদিকরণের নিমিত্ত এবং ভগবানে সমর্পণের নিমিত্ত বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, মন ও প্রাণের সৃষ্টি করিলেন।"

সৃষ্টিবিষয়ে সাংখ্যমত। এস্থলে বলা হইল, ঈশ্বর জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা; কিন্তু সাংখ্যদর্শন বলেন—প্রকৃতিই জগতের সৃষ্টির কারণ; (পূর্ব্বোল্লিখিত পাঁচটী নিত্য বস্তুর অন্যতম যে মায়া, তাহারই অপর নাম প্রকৃতি); জগতের উপাদান-কারণও প্রকৃতি, নিমিত্ত-কারণ বা কর্ত্তাও প্রকৃতি। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিনটী গুণের সমবায়ই প্রকৃতি বা মায়া। পরিদৃশ্যমান জগতে আমরা অনন্ত রকমের জিনিস দেখিতে পাই, তাহাদের পরিদৃশ্যমান উপাদানও অনন্ত রকমের; কিন্তু একই প্রকৃতি কিরূপে এই অনন্ত রকমের বস্তুর অনন্ত রকম উপাদানে পরিণত হইল? ইহার উত্তরে সাংখ্যাচার্য্যগণ বলেন—প্রকৃতি স্বতঃপরিণাম-শীলা; প্রকৃতি অচেতন জড়বস্তু হইলেও ইহার বস্তুগত বা স্বরূপগত ধর্ম্মই এই যে, ইহা আপনা-আপনিই বিভিন্ন বস্তুর বিভিন্ন উপাদান-রূপে পরিণত হইতে পারে এবং বিভিন্ন বস্তুর বিভিন্ন আকারাদিতেও পরিণত হইতে পারে; সুতরাং বিভিন্ন আকারাদি দেওয়ার নিমিত্ত অপর কোনও কর্ত্তা বা নিমিত্ত-কারণের প্রয়োজন হয় না; স্বতঃপরিণাম-শীলা বলিয়া প্রকৃতি যেমন উপাদান-কারণ হইতে পারে, তেমনি নিমিত্ত-কারণও হইতে পারে।

জগতের কারণ ঈশ্বর। শ্রীমৎ-শঙ্করাচার্য্য-প্রমুখ দার্শনিক পণ্ডিতগণ উপনিষদের প্রমাণ প্রয়োগ করিয়া দেখাইয়াছেন যে—জড় প্রকৃতি জগতের উপাদান কারণও হইতে পারে না, নিমিত্ত-কারণও হইতে পারে না। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেন—"জগত-কারণ নহে প্রকৃতি জড়রূপা। শক্তি সঞ্চারিয়া তারে কৃষ্ণ করে কৃপা॥ আদি ৫ম পঃ।" ঈশ্বরই জগতের কারণ, ঈশ্বরের শক্তিতেই প্রকৃতি কারণরূপে পরিণত হয়—প্রকৃতি জড় বলিয়া নিজে স্বতন্ত্রভাবে কারণ হইতে পারে না।

সাংখ্যমতের নিরসন। সাংখ্যাচার্য্যগণ প্রকৃতির জগৎ-কারণত্বের যোগ্যতা দেখাইয়াছেন—তাহার স্বতঃ-পরিণামশীলতা স্বীকার করিয়া। প্রকৃতি স্বতঃ-পরিণামশীলা না হইলে জগতের কারণ হইতে পারিত না। সাংখ্যমত খণ্ডন করিতে যাইয়া বৈষ্ণবাচার্য্যগণ যাহা বলেন, তাহার তাৎপর্য্য বোধ হয় এই যে—প্রকৃতি জড় বা অচেতন বলিয়া স্বতঃ-পরিণামশীলা হইতে পারে না; এবং স্বতঃ-পরিণামশীলা না হইলে প্রকৃতি জগতের কারণও হইতে পারে না। কিন্তু জড় বলিয়া প্রকৃতি স্বতঃ-পরিণামশীলা হইতে পারে না কেন? প্রকৃতি যদি স্বতঃ-পরিণামশীলা হয়, তাহা হইলে এই পরিণামশীলতা হইবে তাহার বস্তুগত বা স্বরূপগত ধর্ম্ম; স্বরূপগত ধর্ম্ম কখনও স্বরূপকে ত্যাগ করে না; সুতরাং প্রকৃতির স্বতঃ-পরিণামশীলতাও কোনও সময়েই প্রকৃতিকে ত্যাগ করিবে না—সকল সময়ে সকল অবস্থাতেই প্রকৃতি পরিণাম প্রাপ্ত হইতে থাকিবে। তাহা হইলে মহাপ্রলয়ে সৃষ্ট-ব্রহ্মাণ্ড ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে যখন প্রকৃতির গুণত্রয় সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখন এই সাম্যাবস্থাও বেশীকাল স্থায়ী হইতে পারিবে না—প্রকৃতির পরিণামশীলতা-বশতঃ সাম্যাবস্থাও অন্য অবস্থায় অবিলম্বেই পরিণত হইবে। কিন্তু শাস্ত্র বলেন—পুনঃসৃষ্টির পূর্ব্বপর্য্যন্ত সুদীর্ঘকাল ব্যাপিয়াই প্রকৃতি সাম্যাবস্থায় অবস্থিত থাকে। ইহাতেই বুঝা যায়—পরিণামশীলতা প্রকৃতির স্বরূপগত ধর্ম্ম নয়—প্রকৃতি স্বতঃ-পরিণামশীলা নয়; সুতরাং একই প্রকৃতি আপনা-আপনি জগতের পরিদৃশ্যমান অসংখ্য বস্তুর

পরিদৃশ্যমান অসংখ্য উপাদানে পরিণত হইতে পারে না—কাজেই জগতের উপাদান-কারণও হইতে পারে না। আবার স্বতঃ-পরিণাম-শীলতার অভাববশতঃ প্রকৃতি আপনা-আপনি পরিদৃশ্যমান বস্তু-সমূহের বিভিন্ন আকারেও পরিণত হইতে পারে না—সুতরাং জগতের নিমিত্ত-কারণও হইতে পারে না। অধিকন্তু, আমরা দেখিতে পাই—জগৎ অনন্ত বৈচিত্রীতে পরিপূর্ণ; বৈচিত্রী বিচার-বুদ্ধিরই ফল; অচেতন বস্তুর বিচার-বুদ্ধি থাকিতে পারে না; সুতরাং অচেতন প্রকৃতি বৈচিত্রীময় জগতের কর্তা বা নিমিত্ত-কারণও হইতে পারে না। ঈশ্বরই জগতের কারণ—নিমিত্ত-কারণও ঈশ্বর, উপাদান-কারণও ঈশ্বর। জগতের প্রত্যেক বস্তুতেই সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটী গুণের ধর্ম্ম বা তাহাদের কোনও একটীর প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যায়; সুতরাং সৃষ্টিব্যাপারে প্রকৃতির সাহচর্য্য আছে সত্য; কিন্তু তাহা গৌণ—তাই প্রকৃতিকে জগতের গৌণ কারণ বলা যাইতে পারে। এসম্বন্ধে একটু আলোচনা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

গৌণ-উপাদান-কারণ-রূপে প্রকৃতির যে অংশ পরিণত হইয়াছে, তাহাকে বলে গুণমায়া—ইহা সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণাত্মিকা। আর যে অংশ গৌণ-নিমিত্ত-কারণ-রূপে পরিণত হইয়াছে, তাহাকে বলে জীবমায়া—ইহা একটী শক্তি-বিশেষ; কিন্তু শক্তি হইলেও জড়-শক্তি,—চৈতন্যময়ী কোনও শক্তিকর্তৃক প্রবর্ত্তিত না হইলে ক্রিয়াশীলা হইতে পারে না।

ঈশ্বরের শক্তিই মুখ্য উপাদান-কারণ। গুণমায়া গৌণ-উপাদান-কারণ। প্রকৃতি স্বতঃ-পরিণাম-শীলা নয় বলিয়া জগতের বিভিন্ন বস্তুর বিভিন্ন উপাদানরূপে পরিণত হওয়ার যোগ্যতা গুণমায়ার নাই। ঈশ্বরের শক্তি তাহাকে এই যোগ্যতা দান করে—অগ্নির শক্তিতে লৌহ যেমন দাহক হওয়ার যোগ্যতা লাভ করে, তদ্রূপ ঈশ্বরের শক্তিতে ত্রিগুণাত্মিকা গুণমায়াও জগতের উপাদানরূপে পরিণত হওয়ার যোগ্যতা লাভ করে। অগ্নির শক্তিব্যতীত লৌহ দাহ করিতে পারে না, পরন্তু লৌহের সাহচর্য্য ব্যতীতও অগ্নি দাহ করিতে পারে বলিয়া অগ্নিকেই যেমন দাহ-কার্য্যের মুখ্য কারণ বলা হয়; তদ্রূপ—ঈশ্বরের শক্তিব্যতীত গুণমায়া জগতের উপাদান হইতে পারে না, পরন্তু গুণমায়ায় সাহচর্য্য ব্যতীতও ঈশ্বরের শক্তি উপাদানরূপে পরিণত হইতে পারে (ভগবদ্ধামাদির উপাদান একমাত্র ঈশ্বরের শক্তি—চিচ্ছক্তি) বলিয়া ঈশ্বরের শক্তি বা ঈশ্বরই হইলেন জগতের মূল-উপাদান-কারণ। আর অগ্নির শক্তিতে লৌহও দাহ করিতে পারে বলিয়া অগ্নিকে যেমন দাহ-কার্য্যের গৌণ কারণ বলা যাইতে পারে, তদ্রূপ ঈশ্বরের শক্তিতে গুণমায়াও জগতের উপাদানত্ব লাভ করে বলিয়া তাহাকে জগতের গৌণ-উপাদান-কারণ বলা হয়।

ঈশ্বরের শক্তিই মুখ্য নিমিত্ত-কারণ। জীবমায়া গৌণ নিমিত্ত-কারণ। আর জীবমায়া ঈশ্বরের শক্তিতে কৃষ্ণবহির্ম্মুখ জীবগণের স্বরূপের জ্ঞান এবং স্বরূপানুবন্ধি কর্ত্তব্যের জ্ঞানকে আবৃত করিয়া মায়িক বস্তুতে তাহাদের আসক্তি জন্মাইয়া দেয়; তাহাতে প্রাকৃত সুখভোগের লালসায় ভোগায়তন দেহ অঙ্গীকারপূর্ব্বক তাহারা প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডে আসিতে প্রলুব্ধ হয় এবং প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডে আসিয়া পড়ে; ইহাতেই ব্রহ্মাণ্ড এবং ব্রহ্মাণ্ডস্থ জীবনিচয়ের সৃষ্টির আনুকূল্য সাধিত হয়। এইরূপে জীবমায়া দ্বারা সৃষ্টিকর্ত্তার আনুকূল্য সাধিত হয় হয় বলিয়া জীবমায়া হইল জগতের গৌণ নিমিত্ত-কারণ; আর মুখ্য নিমিত্ত-কারন হইলেন—ঈশ্বর বা ঈশ্বরের শক্তি।

মায়া ও জীব। বহির্ম্মুখ জীব তাহার অনাদি-বহির্ম্মুখতাবশতঃ অনাদিকাল হইতেই কৃষ্ণের দিকে পেছন ফিরিয়া আছে। তাই, কৃষ্ণই যে সুখস্বরূপ, সুখের একমাত্র উৎস, তাহা সে জানেনা। সে মুখ ফিরাইয়া আছে, মায়িক জগতের সুখসম্ভারের দিকে; তাই মনে করিয়াছে—মায়িক জগতেই তাহার চিরন্তনী সুখবাসনার চরমাতৃপ্তি লাভ হইতে পারিবে। এই ভ্রান্তবুদ্ধিবশতঃ সে মায়িক জগতের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মায়ার চরণে আত্মসমর্পণ করিয়াছে। "স যদজয়াত্বজামনুশয়ীত॥ শ্রী, ভা, ১০।৮৭।৩৮॥ স তু জীবঃ যৎ যস্মাৎ অজয়া অবিদ্যয়া অজাং মায়াং অনুশয়ীত আলিঙ্গেত উপাধিলিপ্তো ভবেদিত্যর্থঃ। শ্রীপাদ বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তিকৃত টীকা।" মায়াও তখন যেন ঈর্ষ্যার সহিতই (সুখস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে ভুলিয়া মায়িক সুখভোগের জন্য তোমার লোভ হইয়াছে! আচ্ছা, এস, মায়িক সুখের

মজা কেমন, একবার চাখিয়া দেখ—এইরূপ ভাবের সহিতই) তাহাকে অঙ্গীকার করিয়া তাহার বুদ্ধিকে মুগ্ধ করিয়া, তাহার স্বরূপের স্মৃতিকে আচ্ছন্ন করিয়া দেহেতে আত্মবুদ্ধি জন্মাইয়া দিল। "পরঃ স্বশ্চেত্যসদ্গ্রাহঃ পুংসাং যন্মায়য়া কৃতঃ। বিমোহিতধিয়াং দৃষ্টস্তস্মৈ ভগবতে নমঃ॥ ইত্যাদি শ্রী, ভা, ৭।৫।১১ শ্লোকের টীকায় শ্রীজীব লিখিয়াছেন—পুংসাং ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাদিত্যাদিরীত্যা অনাদিত এব ভগবদ্‌বিমুখানাং জীবানাম্। অতএব নূনং সের্ষায়া যস্য ভগবতো মায়য়া মোহিতধিয়াং স্বরূপবিস্মরণপূর্ব্বকদেহাত্মবুদ্ধ্যা বিশেষেণ মোহিতবুদ্ধী-নামসতামিত্যাদি।" এসমস্ত দ্বারা বুঝা গেল—অনাদিবহির্ম্মুখ জীব যখন মায়ার চরণে আত্মসমর্পণ করিয়াছে, তখনই মায়া স্বীয় জীবমায়াংশে তাহার স্বরূপের জ্ঞানকে আবৃত করিয়া দেহেতে আত্মবুদ্ধি জন্মাইয়াছে—যেন অনন্যচিত্তে কিছুকাল মায়িক সুখ ভোগ করিয়া সেই সুখের স্বরূপ—সেই সুখের অকিঞ্চিৎকরতা, অনিত্যতা, দুঃখসঙ্কুলতা উপলব্ধি করিতে পারে। বস্তুতঃ অনুভব ব্যতীত বিষয়ের—মায়িক সুখদুঃখের তীক্ষ্ণতা জানা যায় না। "নানুভূয় ন জানাতি পুমান্ বিষয়তীক্ষ্ণতাম্। নির্ব্বিদ্যতে স্বয়ং তস্মান্ ন তথা ভিন্নধীঃ পরৈঃ॥ শ্রী, ভা, ৬।৫।৪১॥" মায়িক সুখদুঃখের তীক্ষ্ণতা অনুভব করিলেই নির্বেদ অবস্থা জন্মিবার এবং তাহার পরে ভগবদুন্মুখতা জন্মিবারও সম্ভাবনা হয়। বস্তুতঃ অনাদি-বহির্ম্মুখ জীবের বিষয়-ভোগ-লালসার তীব্রতা প্রশমিত করিবার উদ্দেশ্যেই ভগবদ্দাসী মায়া তাহাকে বিষয় ভোগ করাইয়া থাকে, মধ্যে মধ্যে অশেষ যন্ত্রণাও দেয়—যেন দুঃখসঙ্কুল সংসার-সুখের প্রতি ভ্রান্ত জীবের বিতৃষ্ণা জন্মে, যেন নিত্যসুখের উৎস শ্রীভগবানে তাহার উন্মুখতা জন্মে।

পরিণামবাদ ও বিবর্ত্তবাদ। প্রসঙ্গক্রমে পরিণামবাদ ও বিবর্ত্তবাদ সম্বন্ধে দু'একটী কথা বলা যাউক। উপনিষৎ বলেন "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম। ছা, ৩।১৪॥—যাহা কিছু দেখিতে পাওয়া যায়, তৎসমস্তই ব্রহ্ম।" বৈষ্ণবাচার্য্যগণ বলেন—ব্রহ্ম সশক্তিক মূল-তত্ত্ব এবং সজাতীয়-বিজাতীয়-স্বগত-ভেদশূন্য আশ্রয়-তত্ত্ব; সুতরাং ব্রহ্মাতিরিক্ত কিছু কোথাও থাকা সম্ভব নহে, সমস্তই স্বরূপতঃ ব্রহ্মই; বিশেষতঃ, ব্রহ্মের বা ঈশ্বরের শক্তি এবং প্রকৃতিই যখন জগতের কারণ এবং প্রকৃতিও যখন ব্রহ্মেরই (বহিরঙ্গা) শক্তি, তখন অনায়াসেই বলা যাইতে পারে যে, ব্রহ্মের শক্তিই জগদ্রূপে পরিণত হইয়াছে। বস্তুতঃ শক্তি ও শক্তিমান্ পরস্পরে অনুপ্রবিষ্ট। মায়াশক্তিতে অনুপ্রবিষ্ট ব্রহ্মই স্বীয় অচিন্ত্য শক্তির প্রভাবে জগদ্রূপে পরিণত হইয়াছেন (১।৪।৮৪ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। ইহাকেই পরিণামবাদ বলা হয়। আর যাঁহারা ব্রহ্মের শক্তি স্বীকার করেন না, শঙ্করাচার্য্য-প্রমুখ সেই সমস্ত আচার্য্যগণ বলেন—ব্রহ্ম যখন নিঃশক্তিক, তখন তাঁহাদ্বারা সৃষ্টিকার্য্য সম্ভব নহে; বস্তুতঃ এই জগতের কোনও অস্তিত্বই নাই; যে স্থানে কোনও বস্তুই নাই, ঐন্দ্রজালিক যেমন সে স্থানেও দর্শকগণকে বিচিত্র বস্তু দেখাইয়া থাকে, তদ্রূপ মায়া আমাদিগকে এই জগৎ-প্রপঞ্চ দেখাইতেছে; ইহা মায়াবিজৃম্ভিত। ঐন্দ্রজালিকের কৌশলে দর্শকগণ যাহা কিছু দেখে, তাহা যেমন ভ্রান্তিমাত্র, তদ্রূপ মায়ার প্ররোচনায় জগৎ বলিয়া আমরা যাহা কিছু দেখি, তাহাও ভ্রান্তিমাত্র; জীবের পরিদৃশ্যমান দেহাদিও ভ্রান্তিমাত্র। ইহাকেই বিবর্ত্তবাদ বলে (বিবর্ত্ত অর্থ ভ্রান্তি)। মায়ার প্রভাব অন্তর্হিত হইলেই অনুভব হইবে যে,—সমস্তই ব্রহ্ম, তদ্‌ব্যতীত অন্য কোনও বস্তুই নাই, জীব তখন বুঝিতে পারিবে—সেও ব্রহ্ম। তাঁহারা আরও বলেন,—ব্রহ্ম নির্ব্বিকার; সুতরাং ব্রহ্ম জগদ্রূপে পরিণত হইতে পারেন না, হইলে তিনি বিকারী হইয়া পড়েন। ইহার উত্তরে বৈষ্ণবাচার্য্যগণ বলেন—পরিদৃশ্যমান জগৎ ভ্রান্তিমাত্র নহে, ইহার অস্তিত্ব আছে, তবে ইহা নশ্বর; আর ঈশ্বরের অচিন্ত্য শক্তির প্রভাবে তিনি জগদ্রূপে পরিণত হইয়াও অবিকারী থাকিতে পারেন। বস্তুতঃ ব্রহ্মের শক্তি স্বীকার না করিলেই বিবর্ত্তবাদের কথা তুলিতে হয়; কিন্তু বিবর্ত্তবাদে অনেক সমস্যারই সমাধান হয় না; বিশেষতঃ বিবর্ত্তবাদ স্থাপন করিতে গেলে যে মায়ার অবতারণা করিতে হয়, শক্তি স্বীকার না করিলে সেই মায়ারও কোনও সন্তোষজনক সমাধান পাওয়া যায় না। জগতেও নানাবিধ শক্তির ক্রিয়া অনবরত প্রত্যক্ষীভূত হইতেছে; ব্রহ্মের শক্তি স্বীকার না করিলে এই সমস্ত শক্তিরও মূল খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। যাহা হউক, এস্থলে এই সমস্ত বিষয়ের আলোচনার স্থানাভাব। প্রস্তাবিত বিষয় আরম্ভ করা যাউক। (১।৭।১১৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)।

কাল ও কর্ম্মের সহায়তা। পাঁচটী অনাদি তত্ত্বের মধ্যে ঈশ্বর, জীব ও মায়া বা প্রকৃতি যে সৃষ্টিকার্য্যের সহিত সংশ্লিষ্ট আছেন, তাহাই এপর্য্যন্ত বলা হইল। ঈশ্বর সৃষ্টি করেন, প্রকৃতি তাঁহারই শক্তিতে তাঁহার সহায়তা করে, আর জীব সৃষ্ট বস্তুর ভোগের নিমিত্ত সৃষ্ট ভোগায়তন-দেহাদি অঙ্গীকার করিয়া সৃষ্টি-ব্যাপারকে সফল করিতে চেষ্টা করে। অন্য দুইটী অনাদি তত্ত্বও—কাল এবং কর্ম্ম বা অদৃষ্টও—সৃষ্টি-ব্যাপারে উপেক্ষণীয় নহে; তাহারাও সৃষ্টির সহায়তা করিয়া থাকে। কাল এবং কর্ম্ম বা অদৃষ্ট জড়—অচেতন; সুতরাং স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কিছু করিতে পারে না; কিন্তু ঈশ্বর-শক্তি দ্বারা প্রবর্ত্তিত হইয়া তাহারাও সৃষ্টিকার্য্যের সহায়তা করে। এতদ্ব্যতীত আর একটী বস্তু আছে—সৃষ্টি-ব্যাপার বুঝিবার পক্ষে যাহার জ্ঞান একেবারে উপেক্ষণীয় নহে। এই বস্তুটী হইতেছে—প্রকৃতির স্বভাব।

প্রকৃতির স্বভাব। অম্লযোগে দুগ্ধ দধিতে পরিণত হয়, কিন্তু ক্ষীর বা সন্দেশে পরিণত হয় না; ইহা দুগ্ধের স্বভাব। অল্প পরে আমরা দেখিতে পাইব—প্রকৃতি পরিণতি প্রাপ্ত হইতে আরম্ভ করিয়া প্রথমতঃ মহত্তত্ত্বে তার পরে অহঙ্কার-তত্ত্বে, তার পরে তন্মাত্রা-ইত্যাদিতে পরিণত হয়; কিন্তু প্রথমতঃ মহত্তত্ত্বে পরিণত না হইয়া অহঙ্কার-তত্ত্বে বা তন্মাত্রাদিতে পরিণত হয় না—ইহা প্রকৃতির স্বভাব।

কালের সহায়তা। আবার অম্লযোগে দধিতে পরিণত হওয়া দুগ্ধের স্বভাব হইলেও অম্লযোগ করা মাত্রই ইহা দধিতে পরিণত হয় না—কিছু সময়ের অপেক্ষা করে; সুতরাং সময় বা কালও দধিতে পরিণতির নিমিত্ত দুগ্ধের সহায়তা করে। তদ্রূপ ঈশ্বর-শক্তিতে প্রকৃতির বিকার-প্রাপ্তি-যোগ্যতা জন্মিলেও সময় বা কালের আনুকূল্য অপরিহার্য্য—সাম্যাবস্থাপন্না প্রকৃতি মহত্তত্ত্বে, মহত্তত্ত্ব অহঙ্কারে, অহঙ্কার-তত্ত্ব তন্মাত্রাদিতে পরিণত হইতে কিছু সময়ের অপেক্ষা করে; সুতরাং সময় বা কালও প্রকৃতির পরিণতির বা সৃষ্টিকার্য্যের আনুকূল্য করিয়া থাকে।

অদৃষ্টের সহায়তা। তারপর অদৃষ্টের কথা। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, লৌকিক-দৃষ্টিতে সৃষ্টি-ব্যাপারের উদ্দেশ্য—জীবের অদৃষ্ট-ভোগ; সুতরাং সৃষ্টি-নিমিত্ত প্রকৃতির পরিণাম এবং সৃষ্টবস্তু—সমস্তই অদৃষ্ট-ভোগের অনুকূল হইবে। ঈশ্বরশক্তি-কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হইয়া কর্ম্ম বা অদৃষ্টই প্রকৃতির পরিণামকে, অথবা সৃষ্টবস্তুকে এই আনুকূল্য দান করে—অথবা ঈশ্বর-শক্তিই জীবাদৃষ্টের অনুকূল-ভাবে প্রকৃতিকে পরিণাম প্রাপ্ত করাইয়া থাকে; সুতরাং প্রকৃতিকে পরিণামপ্রাপ্ত করাইবার পক্ষে অনুরূপতা যোগাইয়া জীবাদৃষ্ট ঈশ্বর-শক্তির সহায়তা করিয়া থাকে।

যাহা হউক, প্রকৃতি (এবং প্রকৃতির স্বভাব), কাল, কর্ম্ম এবং জীবকে লইয়া ঈশ্বর কিরূপে সৃষ্টিকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন, তাহা বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক।

পুরুষ কর্ত্তৃক প্রকৃতিতে শক্তির সঞ্চার ও প্রকৃতির পরিণতি। মহত্তত্ত্ব। সৃষ্টির প্রারম্ভে কারণার্ণবশায়ী পুরুষ (ঈশ্বর) দূর হইতে প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তাহাতে শক্তি-সঞ্চার করেন; এই শক্তি-সঞ্চারের ফলে প্রকৃতির সাম্যাবস্থা নষ্ট হয়, প্রকৃতি বিক্ষুব্ধা হয়। এই বিক্ষোভিতা-প্রকৃতিতে পুরুষ তখন জীবরূপ-বীর্য্যাধান করেন অর্থাৎ স্ব-স্ব-কর্ম্মফল সহ যে সমস্ত জীব মহাপ্রলয়ে সূক্ষ্মরূপে পুরুষকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিতেছিল, পুরুষ সে সমস্ত জীবকে তাহাদের কর্ম্মফল সহ বিক্ষোভিতা প্রকৃতিতে নিক্ষেপ করিলেন। তখন পুরুষ-কর্ত্তৃকই প্রবর্ত্তিত হইয়া কাল ও কর্ম্ম এবং প্রকৃতির স্বভাব প্রকৃতিকে যথাযথ পরিণাম প্রাপ্ত করাইতে লাগিল। এইরূপে জীবাদৃষ্টের অনুকূল প্রথম যে পরিণাম প্রকৃতি লাভ করে, তাহাকে বলে মহত্তত্ত্ব (শ্রীভা ২।৫।২১-২২)। ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি হইতেই মহত্তত্ত্বের উদ্ভব; সুতরাং মহত্তত্ত্বেও সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিনটী গুণ থাকিবেই; তিনটী গুণ থাকিলেও কাল-কর্ম্ম-স্বভাবাদির প্রভাবে মহত্তত্ত্বে সত্ত্ব ও রজোগুণেরই প্রাধান্য; সত্ত্বের ধর্ম্ম জ্ঞান-শক্তি এবং রজঃ-এর গুণ ক্রিয়াশক্তি; সুতরাং মহত্তত্ত্ব ক্রিয়া-জ্ঞান-শক্তিময় একটা উপাদানবিশেষ। (শ্রী, ভা, ২।৫।২৩)।

অহঙ্কার। কাল-কর্ম্মাদির প্রভাবে মহত্তত্ত্ব হইতে আবার এক তত্ত্বের উদ্ভব হইল—ইহার নাম অহঙ্কার; অহঙ্কার-তত্ত্বে তমোগুণেরই প্রাধান্য—সত্ত্ব ও রজোগুণের অল্পতা। এই অহঙ্কার-তত্ত্ব আবার বিকার-প্রাপ্ত হইয়া তিন রূপে অভিব্যক্ত হয়—সাত্ত্বিক অহঙ্কার, রাজস অহঙ্কার এবং তামস অহঙ্কার।

তামসাহঙ্কারের লক্ষণ দ্রব্যশক্তি, রাজস-অহঙ্কারের লক্ষণ ক্রিয়াশক্তি এবং সাত্ত্বিকাহঙ্কারের লক্ষণ জ্ঞানশক্তি (শ্রীভা-২।৫।২৩-২৪)।

বস্তুতঃ কাল-কর্ম্মাদির প্রভাবে সাম্যাবস্থাপন্ন গুণত্রয় যখন পরিণতি প্রাপ্ত হইতে থাকে, তখন তাহার এক অংশে সত্ত্বগুণের, এক অংশে রজো গুণের এবং এক অংশে তমোগুণের প্রাধান্য জন্মে। যে অংশে সত্ত্ব-গুণের এবং যে অংশে রজোগুণের প্রাধান্য জন্মে, সেই দুই অংশকে মহত্তত্ত্ব বলে; যে অংশে রজোগুণের প্রাধান্য, সেই অংশকে সূত্রতত্ত্বও বলে; সূত্রতত্ত্ব মহত্তত্ত্বেরই প্রকার-ভেদ। আর যে অংশে তমোগুণের প্রাধান্য, তাহাকে বলে অহঙ্কার-তত্ত্ব। অহঙ্কার-তত্ত্বে তমোগুণই বেশী, সত্ত্ব ও রজোগুণ অল্প। এই অহঙ্কার-তত্ত্ব আবার বিকার প্রাপ্ত হইয়া তিনরূপে অভিব্যক্ত হয়—সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক অহঙ্কার। তামসিক অহঙ্কারের লক্ষণ দ্রব্যশক্তি, অর্থাৎ ইহাতে মহাভূতাদি দ্রব্য-উৎপাদনের সামর্থ্য আছে; রাজস-অহঙ্কারের লক্ষণ ক্রিয়াশক্তি অর্থাৎ ইহাতে ক্রিয়া-সাধন-ইন্দ্রিয়াদি উৎপাদনের শক্তি আছে; আর সাত্ত্বিক অহঙ্কারের লক্ষণ জ্ঞানশক্তি অর্থাৎ ইহাতে ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃ-দেবতাবিষয়ক সামর্থ্য আছে।

তামসাহংকারের বিকার। তামসাহঙ্কার বিকার প্রাপ্ত হইলে তাহা হইতে শব্দগুণযুক্ত আকাশ উৎপন্ন হয়; আকাশ বিকার প্রাপ্ত হইলে তাহা হইতে স্পর্শগুণযুক্ত বায়ু উৎপন্ন হয়। আকাশ হইতে বায়ুর উদ্ভব বলিয়া বায়ুতে আকাশের গুণ শব্দও থাকে; সুতরাং বায়ুতে শব্দ ও স্পর্শ—এই দুইটী গুণই আছে। এই বায়ু হইতেই প্রাণ (দেহ ধারণ-সামর্থ্য), ওজঃ (ইন্দ্রিয়ের পটুতা), সহঃ (মনের পটুতা) এবং বল (শরীরের পটুতা) জন্মিয়া থাকে। যাহা হউক, ঈশ্বরাধিষ্ঠিত কাল, কর্ম্ম ও স্বভাব বশতঃ ঐ বায়ু যখন বিকার প্রাপ্ত হয়, তখন তাহা হইতে তেজ উৎপন্ন হয়; তেজের স্বাভাবিক গুণ রূপ। বায়ু হইতে ইহার উদ্ভব হওয়ায় ইহাতে শব্দ এবং স্পর্শ গুণও আছে; এইরূপে তেজের গুণ তিনটী—শব্দ, স্পর্শ ও রূপ। এই তেজ বিকার প্রাপ্ত হইলে তাহা হইতে জল উৎপন্ন হয়; জলের গুণ রস। তেজ হইতে উৎপন্ন বলিয়া ইহাতে তেজের গুণ শব্দ, স্পর্শ এবং রূপও আছে; এইরূপে জলের চারিটী গুণ—শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস। জল বিকার প্রাপ্ত হইলে তাহা হইতে ক্ষিতি (মাটী) উৎপন্ন হয়; ক্ষিতির গুণ গন্ধ। জল হইতে উৎপন্ন বলিয়া ক্ষিতিতে জলের গুণ-চতুষ্টয়ও আছে; এইরূপে ক্ষিতির গুণ হইল পাঁচটী—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ। (শ্রীভাঃ ২।৫।২৫-২৯।)

পঞ্চতন্মাত্র ও পঞ্চ মহাভূত। এইরূপে দ্রব্যশক্তিসম্পন্ন তামসাহঙ্কার-তত্ত্ব হইতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস এবং গন্ধ—এই পাঁচটী তন্মাত্র এবং এই পঞ্চতন্মাত্রার স্থূলরূপ বা আশ্রয়—যথাক্রমে আকাশ, বায়ু তেজ, জল এবং ক্ষিতি—এই পাঁচটী মহাভূত—সাকল্যে দশটী বস্তুর উৎপত্তি হয়। এস্থলে যে আকাশাদি পঞ্চ-মহাভূতের কথা বলা হইল, ইহারা পরিদৃশ্যমান আকাশাদি নহে—পরন্তু পরিদৃশ্যমান আকাশাদির সূক্ষ্ম উপাদান মাত্র।

সাত্ত্বিকাহঙ্কারের বিকার মন ও দশ ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। সাত্ত্বিকাহঙ্কার বিকার প্রাপ্ত হইলে তাহা হইতে মন (অর্থাৎ মনের উপাদান) এবং মনের অধিষ্ঠাতা চন্দ্রের (ঈশ্বরাধীন শক্তি-বিশেষের) উৎপত্তি হয়। এই সাত্ত্বিকাহঙ্কার হইতেই পঞ্চ-জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং পঞ্চ-কর্ম্মেন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা দশটী দেবতার উদ্ভব হয়। এই সমস্ত অধিষ্ঠাতৃ-দেবতাগণ ঈশ্বরাধীন শক্তি-বিশেষ—তত্তৎ-ইন্দ্রিয়ের কার্য্যকরী-শক্তিদাতা; প্রাকৃত দেহের চক্ষু-কর্ণাদি ইন্দ্রিয়গণের নিজস্ব কোনও শক্তি নাই; মৃতদেহের শক্তি-হীন ইন্দ্রিয়াদিই তাহার প্রমাণ। ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃ-দেবতাগণের শক্তিতেই চক্ষু-কর্ণাদি স্ব-স্ব-কার্য্য নির্ব্বাহে শক্তিমান হয়। এই অধিষ্ঠাতৃ-দেবতাগণ ঈশ্বর-শক্তি হইলেও ভোগায়তন-প্রাকৃত দেহকে কর্ম্মফল-ভোগের উপযোগী করিবার নিমিত্ত প্রাকৃত-সাত্ত্বিকাহঙ্কার-যোগে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে। (শ্রীভা-২।৫।৩০)।

রাজসাহঙ্কারের বিকার দশ ইন্দ্রিয়। রাজসাহঙ্কার বিকার প্রাপ্ত হইলে তাহা হইতে চক্ষু, কর্ণ নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্-এই পঞ্চ-জ্ঞানেন্দ্রিয়ের এবং বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ—এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের (অর্থাৎ তাহাদের সূক্ষ্ম উপাদানের) উৎপত্তি হয় (শ্রীভা-২।৫।৩১)।

বিকার-সমূহের মিলনের অসামর্থ্য। শব্দ-স্পর্শাদি পাঁচটী বস্তুই ভোগের বিষয় ; তাহাদের আশ্রয়রূপে তাহাদের স্থূলরূপ-আকাশাদিও ভোগ্য বস্তু ; তাহাদের পরস্পর মিলনেই উপভোগ্য রসের বৈচিত্রী জন্মিতে পারে। ঈশ্বরাধিষ্ঠিত অদৃষ্টের প্রেরণায় কালবশে প্রকৃতি শব্দ-স্পর্শাদিতে এবং তাহাদের আশ্রয়রূপ আকাশাদিতে পরিণত হইয়াছে ; কিন্তু তাহারা পৃথক্ ভাবেই অবস্থান করিতেছিল ; কারণ, জীবাদৃষ্টানুরূপ বিচিত্র ভোগ্য বস্তুর উৎপাদনের অনুকূলভাবে পরস্পরের সহিত সম্মিলিত হওয়ার যোগ্যতা তাহাদের তখনও ছিল না। আর যে দশ-ইন্দ্রিয় এবং তাহাদের অধিপতিরূপ একাদশ ইন্দ্রিয় মনের কথা বলা হইয়াছে, তাহারা যখন স্ব-স্ব-অধিষ্ঠাতৃ-দেবতার শক্তিতে শক্তিমান হয়, তখনই তাহারা শব্দ-স্পর্শাদি উপভোগের করণ-রূপে যোগ্যতা লাভ করিতে পারে ; কিন্তু অধিষ্ঠাতৃ-দেবতার শক্তি লাভের পূর্ব্বে, অদৃষ্টানুরূপ কোনও ভোগায়তন-দেহে তাহাদের সমাবেশ এবং স্থূলরূপে অভিব্যক্তি—অদৃষ্ট-ভোগের পক্ষে অপরিহার্য্য। কিন্তু ভোগায়তন-দেহের উপাদানরূপ আকাশাদি পঞ্চ-মহাভূতের পরস্পর সম্মিলন-সামর্থ্য না থাকায় এবং উল্লিখিত ইন্দ্রিয়াদিরও পরস্পর সম্মিলন-সামর্থ্য বা স্থূলরূপে অভিব্যক্তি-সামর্থ্য না থাকায়, সমস্তই পৃথক্ পৃথক ভাবে অবস্থান করিতে লাগিল (শ্রীভা ২।৫।৩২)।

সম্মিলন-নিমিত্ত সংহননশক্তির প্রয়োজন। সাধারণতঃ দেখা যায়, কেবলমাত্র একটী শক্তি যখন কোনও বস্তুর উপর প্রয়োজিত হয়, তখন কেবল একদিকেই তাহার ক্রিয়া চলিতে থাকে ; শক্ত্যন্তরের ক্রিয়া ব্যতীত তাহার গতির পরিবর্ত্তন হইতে পারে না। কারণার্ণবশায়ী পুরুষ প্রথমে প্রকৃতিতে যে শক্তি প্রয়োগ করিলেন, তাহা কেবল এক দিকেই—প্রকৃতির পরিণতির দিকেই—ক্রিয়া করিতে লাগিল ; তাহার ফলে প্রকৃতি বিভিন্নরূপ বিকার প্রাপ্ত হইল ; কিন্তু ঐ পরিণতি-দায়িনী শক্তি প্রকৃতির বিকার-সমূহের সম্মিলন-দানে সমর্থা নহে, তাই পঞ্চভূতাদি পৃথক পৃথক্ ভাবে অবস্থান করিতে লাগিল। তাহাদের সম্মিলনের জন্য অন্য একটী সংহনন-শক্তির (সম্মিলনদায়িনী শক্তির) প্রয়োজন। এই সংহনন-শক্তি যখন ক্রিয়া করিবে, পরিণতি-দায়িনী শক্তির ক্রিয়াও তখন সম্মিলনের পক্ষে অপরিহার্য্য ; কারণ, সম্মিলনও পরিণতিরই বৈচিত্রী-বিশেষ। উভয় শক্তিরই যুগপৎ ক্রিয়া দরকার।

সংহনন-শক্তির প্রয়োগ। ভৌতিক হৈম অণ্ড। বহু অণ্ডের সৃষ্টি। বস্তুতঃ কারণার্ণবশায়ী আকাশাদি সমস্ত বস্তুতেই সংহনন-শক্তি সঞ্চার করিলেন (শ্রীভা ৩.২৬।৫০)। তখন উভয় শক্তির যুগপৎ ক্রিয়ায় ঈশ্বরাধিষ্ঠিত কালকর্ম্মাদির প্রভাবে মহাভূতাদি সম্মিলিত হইতে লাগিল এবং তাহাদের সম্মিলনে একটী ভৌতিক অণ্ডের সৃষ্টি হইল (শ্রীভা ৩।২০।১৪)। অণ্ড একটি গোলাকার বস্তু। ঘূর্ণন ব্যতীত কোনও তরল বা কোমল বস্তু গোলাকারত্ব প্রাপ্ত হইতে পারে না ; আবার কেন্দ্রাভিমুখিনী-শক্তির ক্রিয়া ব্যতীত কোনও বস্তুর ঘূর্ণনও সম্ভব নয়। সংহননশক্তির প্রভাবে মহাভূতাদি সম্মিলিত হইয়া যখন অণ্ডাকারে পরিণত হইয়াছে বলিয়া জানা যায়, তখন ঐ সংহনন-শক্তিটি যে কেন্দ্রাভিমুখিনী শক্তি—অণ্ডের কেন্দ্র হইতেই যে ইহা ক্রিয়া করিতেছে—তাহাও অনুমিত হইতেছে। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—ঐ অণ্ডটি "হৈম" অণ্ড ; হৈম অর্থ হেমবর্ণ—উজ্জ্বল, জ্যোতির্ম্ময়। ইহাও জানা যায়, ঐ অণ্ডটী নাকি বহুকাল যাবৎ সাগর-জলে শয়ান ছিল (শ্রীভা ৩।২০.১৫)। এই সাগর অধুনা পরিদৃশ্যমান সাগর নহে—তাহা হইতে পারে না ; কারণ, তখনও পরিদৃশ্যমান স্থূল জলের সৃষ্টি হয় নাই। বোধ হয় নীহারিকাবৎ কোনও সূক্ষ্ম বাষ্পীয় পদার্থকেই এস্থলে সাগর-জল বলা হইয়া থাকিবে—ইহা তখন সমগ্র অণ্ডকে বেষ্টন করিয়া সর্ব্বদিকে অবস্থিত ছিল ; তেজঃপ্রভাবেই বোধ হয় ইহা তখন জ্যোতির্ম্ময় (হৈম)-রূপে প্রতিভাত হইয়াছিল। তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে ভূতাদির সম্মিলনজনিত যে বস্তুটী সংহনন-শক্তির ক্রিয়ায় অণ্ডাকারত্ব লাভ করিয়াছে, তাহাও প্রথমতঃ নীহারিকা অথবা নীহারিকারই স্থূলরূপ কোনও বাষ্পীয় বা তরল পদার্থময়ই ছিল ; নচেৎ গোলাকারত্ব প্রাপ্তি সম্ভব নহে। কালক্রমে সংহনন-শক্তির ক্রিয়ায় ঘূর্ণন বশতঃ অণ্ডের বহির্ভাগ ক্রমশঃ তরল ও পরে কঠিন হইতে কঠিনতর হইতে থাকে—অংশবিশেষ মূল অণ্ড হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াও যাইতে থাকে ; এইরূপে আবার অসংখ্য অণ্ডের সৃষ্টি হইতে থাকে। মূল অণ্ডের প্রত্যেক সূক্ষ্ম অংশেও পরিণতি-দায়িনী শক্তি এবং সংহনন-শক্তির ক্রিয়া থাকাতে বিচ্ছিন্ন অণ্ড সমূহেও ঐ দুইটী শক্তির ক্রিয়া রহিয়া গেল—তাই তাহারাও অণ্ডাকারত্বই প্রাপ্ত হইল। এ সকল

অণ্ডের প্রত্যেকটীতেই পুরুষের শক্তি কেন্দ্রাভিমুখিনী শক্তিরূপে ক্রিয়া করিতে লাগিল। এই কেন্দ্রাভিমুখিনী শক্তির যে অধিষ্ঠাতা, তিনিও কারণার্ণবশায়ীরই একটী স্বরূপ—প্রত্যেক অণ্ডের কেন্দ্রে তাঁহার অধিষ্ঠান। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত স্পষ্ট কথায়ই বলিয়াছেন:—"অগণ্য অনন্ত যত অণ্ড সন্নিবেশ। ততরূপে পুরুষ করে সভাতে প্রবেশ॥ ১।৫।৫৯। সেই পুরুষ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সৃজিয়া। সব অণ্ডে প্রবেশিলা বহু মূর্ত্তি হঞা॥ ১।৫।৭৮॥"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আরও বলেন, সেই পুরুষ এক এক রূপে অণ্ড সমূহের—"ভিতরে প্রবেশি দেখে সব অন্ধকার। ১।৫।৭৯॥" তখন তিনি—"নিজ অঙ্গে স্বেদজল করিল সৃজন। সেই জলে কৈল অর্দ্ধ ব্রহ্মাণ্ড ভরণ॥ ১।৫।৮০॥ জলে ভরি অর্দ্ধ তাঁহা কৈল নিজবাস। ১।৫।৮২॥" এজন্য পুরুষের এই স্বরূপকে গর্ভোদশায়ী পুরুষ বলে।

উল্লিখিত পয়ার-সমূহ হইতে বুঝা যায়, অণ্ড-সমূহের অভ্যন্তর-ভাগ জলবৎ তরল পদার্থে পূর্ণ ছিল; ইহা স্বাভাবিক; অভ্যন্তর-ভাগে তাপাধিক্য বশতঃ এইরূপ হইয়া থাকে। ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন—পৃথিবীর অভ্যন্তর-ভাগ এখনও অত্যধিক তাপময় তরল পদার্থে পরিপূর্ণ।

গর্ভোদকশায়ী। যাহা হউক, কেন্দ্রাভিমুখিনী সংহনন-শক্তির প্রবর্ত্তকরূপে গর্ভোদশায়ী প্রত্যেক অণ্ডের মধ্যে অবস্থান করিলেন; তখনও জীবের ভোগায়তন দেহাদির অর্থাৎ জীবের সৃষ্টি হয় নাই। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—গর্ভোদশায়ী পুরুষ সহস্রাধিকবর্ষ যাবৎ ঐরূপে অবস্থান করার পরে ব্যষ্টি জীবের সৃষ্টি আরম্ভ হয় (শ্রীভা ৩।২০।১৫)। ইহাতেই বুঝা যায়, তাপ-বিকীরণাদি দ্বারা অণ্ডের বহির্ভাগ জীব-বাসের উপযোগী হইতে সুদীর্ঘকালের প্রয়োজন হইয়াছিল।

যাহা হউক, ব্যষ্টিজীবের সৃষ্টির পূর্ব্বে সর্ব্বপ্রথমে ব্রহ্মার সৃষ্টি হইল—পুরুষ ব্রহ্মাতে শক্তিসঞ্চার করিয়া তাঁহা-দ্বারা পূর্ব্বসৃষ্ট উপাদানাদির সাহায্যে জীবাদৃষ্টের অনুকূল ভোগায়তন-দেহ এবং ভোগ্যবস্তু-আদির সৃষ্টি করিলেন—সংহনন-শক্তির ক্রিয়ায় মহাভূতাদিই ঈশ্বরাধিষ্ঠিত কালকর্ম্মের প্রভাবে তত্তদ্রূপে পরিণত হইল; তখন জীবমায়ার প্রভাবে জীব স্বস্ব-অদৃষ্টানুরূপ ভোগায়তন-দেহে প্রবেশ করিয়া সৃষ্ট ব্রহ্মাণ্ডে রূপ-রসাদি উপভোগ করিতে লাগিল। গর্ভোদশায়ী জীবান্তর্য্যামী পরমাত্মারূপে প্রত্যেক জীবের মধ্যে থাকিয়া তাহার কর্ম্মফল দান করিতে লাগিলেন।